ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১২ সংখ্যা : ৪৭
জুলাই : সেপ্টেম্বর ২০১৬

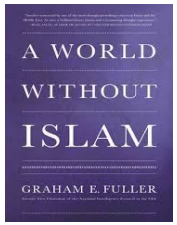

বুক রিভিউ

A World Without Islam

(ইসলামহীন বিশ্ব)

ধর্ম ও ইতিহাসের অনন্য এক নির্মোহ ব্যাখ্যাগ্রন্থ

লেখক: গ্রাহাম ই. ফুলার, প্রকাশক: ব্যাক বে বুকস/ লিটল, ব্রাউন এন্ড কোম্পানি, নিউইয়র্ক-বোস্টন-লন্ডন, হেচেটি বুক গ্রুপ, ২৩৭ পার্ক এ্যাভিনিউ, নিউইয়র্ক, এনওয়াই ১০০১৭, ইউএসএ, এপ্রিল ২০১২ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৩৮৫

কী হতো ইসলাম নামের ধর্মটি যদি একেবারেই না থাকতো, ইসলামের আবির্ভাব কোনো দিনই না ঘটতো? অনেকের কাছে এর সহজ উত্তর : সভ্যতার সজ্ঞাত হতো না, হতো না কোনো ধর্মযুদ্ধ, বিশ্বে সন্ত্রাস থাকতো না, বিশেষ করে বিশ্ব থাকতো ধর্মীয় সন্ত্রাসমুক্ত। ফিলিস্তিন সমস্যার সৃষ্টি হতো না। আমরা পেতাম শান্তিময় এক বিশ্ব। উত্তরটা মোটামুটি এমনই হতো। কারণ অনেকের কাছে, বিশেষ করে পাশ্চাত্যের লোকদের বদ্ধমূল ধারণা– আজকের দিনের বেশিরভাগ বিশ্বসঙ্কটের জন্য দায়ী ইসলাম। মুসলিমরা সন্ত্রাসী। কিন্তু আমেরিকান লেখক গ্রাহাম ই. ফুলার (Graham E. Fuller) তার বহুল আলোচিত 'অ্যা ওয়ার্ল্ড উইদাউট ইসলাম' (A World Without Islam) বইটিতে এ প্রশ্নের ভিন্নতর উত্তর দিয়েছেন। তার অভিমত, ইসলাম না থাকলে দুনিয়া আজকের মতোই সজ্ঞাতপূর্ণ থাকত, ভিন্নতর কিছু হতো না।

আসলে এই বইটি পাশ্চাত্যকে মুসলিম ও ইসলাম সম্পর্কে নতুন করে ধারণা পাওয়ার ও ভাববার বিকল্প পথ খুলে দেবে। কিন্তু এ বইয়ের মাধ্যমে গ্রাহাম ই. ফুলার এর প্রমাণ হিসেবে বিকল্প কোনো ইতিহাস উপস্থাপন করেননি। বরং তিনি ইতিহাসের চির পরিচিত ঘটনাগুলো সামনে এনে এসব ঘটনায় ধর্মের সাথে পুরোপুরি সংশ্লিষ্টহীন 'মোটিভেটিং ফ্যাক্টরগুলো' চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। এই বইটিতে তিনি যেসব যুক্তি ও অভিমত তুলে ধরেছেন, সেগুলো মধ্যপ্রাচ্য ও মুসলিম এশিয়ার দীর্ঘদিনের ইতিহাস সম্পর্কে তার নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও গভীর ভাবনাচিন্তাপ্রসূত। বইটিতে তিনি উল্লেখ করেছেন, "যুবজীবনের প্রথম থেকেই আমি মধ্যপ্রাচ্যের ছাত্র

ছিলাম। তখন আমার কল্পনা আটকে যায় এই অঞ্চল সম্পর্কিত বিভিন্ন ছবি, বই, সঙ্গীত ও চলচ্চিত্রে। এ অঞ্চল বিষয়ে অসংখ্য বই আমি পড়েছি। আমি দেড় দশক সময় ধরে বসবাস করেছি, কাজ করেছি ও পড়াশোনা করেছি মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে। বিভিন্ন তারিখের ব্যাপারে স্মৃতি শাণিত করতে প্রথমত ব্যবহার করেছি মূলধারার বিভিন্ন রেফারেন্স সোর্স। আর প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দ্বন্দ্ব বিষয়ে আরও বিস্তারিতে যেতে ব্যবহার করেছি এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা, এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম এবং উইকিপিডিয়া।"

গ্রাহাম ফুলার একজন আমেরিকান লেখক ও রাজনীতি বিশ্লেষক। তিনি বিশেষজ্ঞ জ্ঞান রাখেন ইসলামী চরমপন্থা বিষয়ে। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স কাউন্সিল (National Inteligence Council)-এর সাবেক ভাইস-চেয়ার। কাবুলে সিআইএ'র স্টেশন চিফ হিসেবেও কাজ করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতর ও সিআইএ-তে ২৭ বছর কাটিয়ে মধ্যপ্রাচ্যবিষয়ক বিশেষজ্ঞ রাজনীতিবিজ্ঞানী হিসেবে যোগ দেন অলাভজনক গ্লোবাল পলিসি থিঙ্কট্যাঙ্ক র‍্যান্ড (রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট) করপোরেশনে। ২০০৬ সাল পর্যন্ত ইতিহাসের অ্যাডজাঙ্কড প্রফেসর হিসেবে অ্যাফিলিয়েটেড ছিলেন ব্রিটিশ কলম্বিয়ার ভ্যাঙ্কুভারের সাইমন ফ্রেশার ইউনিভার্সিটির সাথে।

২০১০ সালে প্রথম প্রকাশিত 'অ্যা ওয়ার্ল্ড উইদাউট ইসলাম' বইটি ছাড়াও তিনি আরও বেশ কয়টি বই লিখেছেন। সেগুলো হচ্ছে– দ্য সেন্টার অব ইউনিভার্স: দ্য জিওপলিটিক্স অব ইরান, ১৯৭১; দ্য ডেমোক্র্যাসি ট্র্যাপ: দ্য পেরিলস অব পোস্ট-কোল্ড ওয়ার; হাউ টু লার্ন অ্যা ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ, ১৯৯৩; দ্য ফিউচার অব পলিটিক্যাল ইসলাম (রিভাইজড), ২০০৩; দ্য নিউ তার্কিশ রিপাবলিক : তার্কি অ্যাজ অ্যা পিভোটাল স্টেট ইন দ্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড, ২০০৮; থ্রি ট্রুথস অ্যানড অ্যা লাই, ২০১২। এ ছাড়া তিনি কমপক্ষে আরও পাঁচটি বইয়ের সহ-লেখক।

তার আলোচ্য 'অ্যা ওয়ার্ল্ড উইদাউট ইসলাম' বইটি চোখ খুলে খোলে দেয়ার মতো বই। বইটি এর পাঠকদের শেখাবে প্রচলিত ধারণার বাইরে এসে মুসলিম বিশ্বকে ভিন্ন প্রেক্ষাপট থেকে দেখতে। পাশ্চাত্যের ধারণা, মুসলিমরা খ্রিষ্টানদের চেয়ে মনমানসিকতার দিক থেকে অধিকতর অসহিষ্ণু। মুসলিমরা জানে শুধু সন্ত্রাস করতে। কিন্তু এই বই পাঠ করলে পাশ্চাত্যের এ ধারণার অসারতা ধরা পড়বে। বইটিতে গ্রাহাম ফুলারের তুলে ধরা অনন্য ব্যাখ্যায় দেখা যাবে, পাশ্চাত্য মুসলিমদের যেভাবে দেখে তা ন্যায়সঙ্গত নয়। আজকের মুসলিম বিশ্ব যে সমস্যায় নিপতিত এর জন্য অংশত দায়ী পাশ্চাত্যের অবলম্বিত নীতি-অবস্থান। অতএব, এই লেখকের পরামর্শ হচ্ছে, পাশ্চাত্যের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের মাধ্যমে মুসলিমদের শান্তিপূর্ণ

জীবনযাপন করতে দেয়া উচিত। তার অভিমত, পাশ্চাত্যকে মুসলিমদের দিকে আঙুল উঁচানো বন্ধ করা উচিত এবং ইসলামকে 'রুট অব দ্য প্রবলেম' অভিধায় অভিহিত করা বন্ধ করতে হবে। তিনি বলতে চেয়েছেন, ইসলামহীন দুনিয়া আমাদের আজকের দুনিয়া থেকে আলাদা কিছু হতো না। আজকের দুনিয়ায় যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত, এর সবকিছু পেছনে ধর্ম দায়ী নয়। আসলে কায়েমী স্বার্থান্বেষী মহল নিজেদের প্রতি সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে সবকিছুতেই ধর্মকে টেনে এনে আগুনে ঘি ঢালে। সবকিছুতেই 'ইসলাম' নামের লেবেল এঁটে দিতে পারলেই এরা খুশি। বিষয়টি জটিল। এর সরলীকরণ দরকার। মধ্যপ্রাচ্য খুবই জটিল। সেখানে আছে প্রচুর সমস্যা। দুর্ভাগ্য, ধরেই নেয়া হয় এসব সমস্যার মূলে রয়েছে 'ইসলাম'। ইতিহাসের শেকড় সন্ধান করলে ও ধর্মতত্ত্বের গভীরে পৌঁছলে এ ধারণা ভুল প্রমাণিত হবে। এই বইয়ের মাধ্যমে গ্রাহাম ফুলার সে কাজটিই করেছেন সফলতার সাথে।

বইটির শুরুতেই রয়েছে একটি সূচনা অধ্যায়। এর পর রয়েছে মূল বইয়ের তিনটি অংশে মোট ১৪টি অধ্যায়। 'হেরেসি অ্যান্ড ইসলাম' শিরোনামের প্রথম অংশে আছে ৬টি অধ্যায়। 'মিটিং অ্যাট দ্য সিভিলাইজেশনাল বর্ডারস অব ইসলাম' শিরোনামের দ্বিতীয় অংশে রয়েছে ৫টি অধ্যায়। আর ৩টি অধ্যায় সম্বলিত তৃতীয় অংশের শিরোনাম 'দ্য প্লেস অব ইসলাম ইন দ্য মডার্ন ওয়ার্ল্ড'।

তিনি বইটির সূচনা অংশের তৃতীয় অনুচ্ছেদে প্রসঙ্গত প্রশ্ন রেখেছেন : "যদি ইসলাম না থাকত, আরব মরুভূমিতে নবী মুহাম্মদের স. আবির্ভাব না ঘটত এবং এশিয়া, আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের ব্যাপক অংশে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ার বিজয়ের কাহিনীপরম্পরা না থাকত, তা হলেও কি মধ্যপ্রাচ্যের সাথে পাশ্চাত্যের সম্পর্ক সম্পূর্ণ ভিন্ন কিছু কি হতো?" একই সাথে তিনি এর জবাবে উল্লেখ করেছেন : "না, আমার অভিমত, তখনও পরিস্থিতিটা ঠিক তেমনই থাকত, যেমনটি আজকে দেখছি।"

এ বইয়ের সূচনা পর্বে তিনি আরও উল্লেখ করেছেন, পাশ্চাত্য, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র বিগত অর্ধশতাব্দীর আগে মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ও টেকসই আগ্রহ দেখায়নি। পাশ্চাত্য শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, অথবা এমনকি এক সহস্রাব্দ ধরে এই অঞ্চলে চলা পাশ্চাত্যের ইন্টারভেনশনিজমের তথা হস্তক্ষেপবাদের ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ থাকাটাকেই স্বস্তিদায়ক ভেবেছে। তেলসম্পদ, অর্থায়ন, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, পাশ্চাত্যের হয়ে পরিচালিত অভ্যুত্থান, পাশ্চাত্যপন্থী স্বৈরশাসকদের প্রতি পাশ্চাত্যের সহায়তা, এবং জটিল ফিলিস্তিন সমস্যায় ইসরাইলের প্রতি আমেরিকার নিরঙ্কুশ সমর্থন– যে সমস্যার শেকড় মোটেও ইসলামে নেই, বরং এর শেকড় প্রোথিত ইউরোপীয় ইহুদি নিপীড়ন ও বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের মধ্যে– ইত্যাদি সম্পর্কে পাশ্চাত্যনীতির সমালোচনামূলক বিষয় সম্পর্কে পাশ্চাত্য শুধু ভাসাভাসাভাবে সজাগ।

ইউরোপীয় শক্তিগুলোও তাদের স্থানীয় ঝগড়াঝাটি রফতানি করেছে এবং নিজেদের বিজড়িত করেছে দু'টি বিশ্বযুদ্ধে, যে যুদ্ধ অংশত চলেছে মধ্যপ্রাচ্যের মাটিতে, আর স্নায়ুযুদ্ধের বেশিরভাগটাই চলেছে এই মধ্যপ্রাচ্যেই।

বইটিতে লেখক সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন– "এই বইটির লক্ষ্য বিশ্ব ইতিহাসে ইসলামের ভূমিকায় কালিমালেপন কিংবা এর ভূমিকা মোটেও অস্বীকার করা নয়। ইতিহাসের একটি বৃহত্তম, অব্যাহত ও শক্তিশালী সভ্যতা হিসেবে বিশ্বে ইসলামের বড় ধরনের প্রভাব রয়েছে। ইসলামের মতো আর কোনো সভ্যতা বিশ্বে এত ব্যাপকভাবে এত দীর্ঘসময় টিকে থাকেনি। ইসলামী সংস্কৃতি, শিল্পকলা, বিজ্ঞান, দর্শন, সভ্যতা এবং মানুষ হিসেবে ইসলামের অনুসারীদের প্রতি আমার ব্যাপক শ্রদ্ধা রয়েছে। ইসলামী সভ্যতার অবর্তমানে বিশ্ব আরও বেশি নিঃস্ব হয়ে যেত। আমি একথাও এড়িয়ে যেতে চাই না, ইসলাম সৃষ্টি করছে এক শক্তিশালী ও স্বতন্ত্র সৌধ- 'মুসলিম ওয়ার্ল্ড'। ইসলাম এটি করেছে বিভিন্ন মানুষ, রাষ্ট্র, সংস্কৃতি ও ভূখণ্ডের মধ্যে সংযোগ এমনভাবে গড়ে তুলে, যা অন্য কোনোভাবে করা যেত না। বিষয়টি এ অঞ্চলের মানুষের জন্য ব্যাপক গুরুত্বপূর্ণ। তবে এই বইটির আলোকপাতে আমার বিশেষত আগ্রহের বিষয় হচ্ছে, ইসলাম না থাকলে পাশ্চাত্য ও মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যে সম্পর্কটা কেমন হতো।"

বইটিতে লেখক এমনও উল্লেখ করেছেন, পাশ্চাত্যকে শুধু অভিযোগ করাও তার অভিপ্রায় নয়। তার অভিমত– গভীর ভূ-রাজনৈতিক অনেক বিষয়-আশয় প্রাচ্য ও পাশ্চাতের মধ্যে অসংখ্য দ্বান্দ্বিক বিষয়ের জন্ম দিয়েছে, যা ঘটেছে ইসলামের আগের যুগে এবং ইসলামের আবির্ভাবের পর তা অব্যাহত রয়েছে ইসলামের সাথে ও ইসলামকে ঘিরে। লেখক এই বইটিতে যেসব অভিমত ও যুক্তিতর্ক তুলে ধরেছেন তা তিনি ইতিহাসের নির্মোহ বিশ্লেষণের সূত্রেই করেছেন। সেইসাথে সামনে নিয়ে এসেছেন ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মীয় ইতিহাস। তিনি আলোচনায় তুলে এনেছেন ইহুদি, খ্রিষ্টান ও ইসলাম ধর্মের বহুমাত্রিক ধর্মতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক দিক। তেমনি এই বইটিতে আছে আব্রাহামিক ধর্মগুলোসংশ্লিষ্ট (খ্রিষ্টান, ইহুদি ও ইসলামের) ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ খুঁটিনাটি। তুলনামূলকভাবে কম হারে হলেও হিন্দু ধর্মের প্রসঙ্গও এসেছে এই বইয়ে। লেখকের এসব বিষয়ে নির্মোহ আলোচনা ইসলাম ও মুসলিমদের সম্পর্কে পশ্চিমা লোকদেরকে এবং একই সাথে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদেরও অনেক ভুল ভাঙাতে সহায়তা করবে।

ধর্মগুলোর মধ্যে সঙ্ঘাত সম্পর্কে গ্রাহাম ই. ফুলার এই বইয়ে উল্লেখ করেন, "ধর্মগুলো ও এর অনুসারীদের মধ্যে যে সঙ্ঘাত, তা খুব কমই সুনির্দিষ্ট ধর্মতাত্ত্বিক মতপার্থক্যভিত্তিক। বরং এ সঙ্ঘাতের পেছনে রয়েছে এদের রাজনৈতিক ও সামাজিক

বিভিন্ন প্রভাব। চলুন পরীক্ষা করে দেখা যাক, ইহুদি, খ্রিষ্টান ও ইসলাম ধর্মের ধর্মতাত্ত্বিক পার্থক্যের সারসংক্ষেপ। এসব ধর্মতাত্ত্বিক পার্থক্য প্রাচীন ও মধ্যযুগের মধ্যপ্রাচ্যে সত্যিকার অর্থে কতটুকু প্রাসঙ্গিক ছিল? ঘনিষ্ঠভাবে লক্ষ করলে আমরা দেখি, একেশ্বরবাদের প্রকৃতি সম্পর্কে অব্যাহতভাবে বারবার সুনির্দিষ্ট কিছু মৌলিক যুক্তির অবতারণা করা হয়, যা পরিব্যাপক বিভিন্ন অঞ্চল ও সংস্কৃতিতে। আমরা লক্ষ করি, ইসলাম ধর্মতাত্ত্বিকভাবে এর ক্ষেত্র পরিবর্তন না করেও, বরং এক ধরনের ধর্মগত অবিচ্ছিন্নতা জোরদার রেখে অন্য ধর্মগুলোর সাথে একটি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান মেনে নেয় । 'জনপ্রিয় আধুনিক তত্ত্ব' হচ্ছে– ইসলাম উপস্থাপন করে কিছু 'ডিজরাপটিভ কালচার' ও 'থিওলজিক্যাল ফোর্স', যা ইহুদি-খ্রিষ্টান ধর্মবিশ্বাস থেকে ভিন্ন। আর এ বিষয়টি মুসলিমদের মধ্যে পাশ্চাত্যবিরোধী মনোভাবের প্রারম্ভিক বুনিয়াদ গড়ে তুলে। তা পুরোপুরি ইসলামের সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ থেকে বাদ দিতে হবে। আসলে ইসলাম উপস্থাপন ও সম্প্রসারণ করে মধ্যপ্রাচ্যের গভীরতম কিছু সাংস্কৃতিক ও দার্শনিক প্রবণতা, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত পশ্চিমাদের প্রতি কিছু গার্ডেড অ্যাটিচ্যুড। ইসলাম সৃষ্টি করেনি এসব প্রবণতা; ইসলামকে দূরে সরিয়ে নিন, এর পরও এসব প্রবণতা থেকে যাবে।"

এর পরপরই লেখক আলোকপাত করেছেন এসব ধর্ম একটি আরেকটিকে কোন দৃষ্টিতে দেখে, তার ওপর। এ প্রসঙ্গে লেখক উল্লেখ করেছেন, "খ্রিষ্টানদের বিশ্বাস যিশু ছিলেন মিসাইয়া (মানবজাতির ত্রাণকর্তা, খ্রিষ্টানদের মধ্যে যীশু হচ্ছেন সেই মিসাইয়া), যার আগমণ উপলক্ষে ওল্ড টেস্টামেন্টে আগেই বলা হয়েছিল। ইহুদিরা যিশুকে মিসাইয়া মানে না। ইহুদিরা বিশ্বাস করে, মানব জাতির ত্রাণ কর্তা হিসেবে মিসাইয়ার আবির্ভাব ঘটবে। কিছু খ্রিষ্টানের দৃষ্টিতে, ইহুদিরা হচ্ছে সব হেরেটিকের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট হেরেটিক (প্রচলিত ধর্মমতবিরোধী)। কারণ, আসলে এরা অস্বীকার করে সেই মিসাইয়াকে, যার আগমণ উপলক্ষে আগাম উল্লেখ রয়েছে এদের নিজেদের ধর্মগ্রন্থেই। ইহুদি পণ্ডিতেরা ব্যাপকভাবে এ অভিমত প্রত্যাখ্যান করে একথা দাবি করেন যে, এটি একদম স্পষ্ট– ওল্ড টেস্টামেন্টের প্রফেসি মতে যিশু মিসাইয়া নন। তাদের দাবি, সত্যিকারের মিসাইয়া হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার জন্যে তাকে কিছু মিসাইয়ানিক প্রফেসির পূরণ করতে হবে : তাকে কিং ডেভিডের ঘরে জন্ম নিতে হবে (গড যিশুর জন্ম দিয়েছেন অন্তর্নিহিতভাবে); তাকে অবশ্যই তোরাহ'র (বাইবেলোক্ত মহাপুরুষ মোজেজের অনুশাসনাবলি) আইন মানতে হবে (স্পষ্টত যিশু তা করেননি এবং সে আইন পাল্টাতে চেয়েছিলেন)। সত্যিকারের মিসাইয়া এগিয়ে যাবেন একটি শান্তির যুগের দিকে, যেখানে থাকবে না ঘৃণা ও নিপীড়ন– যা ঘটেনি। ওল্ড টেস্টামেন্টে প্রত্যাশা ছিল, মিসাইয়ার এসব রিভিলেশন তাৎক্ষণিকভাবে পূরণ করবেন, 'সেকেন্ড কামিং'-এর পরে নয়, যার উল্লেখ ওল্ড টেস্টামেন্টে নেই। ইহুদিরা

এ ধারণাও মানে না যে, যিশুর ত্যাগের বিনিময়ে কিংবা অন্য কারও মাধ্যমে মানবজাতির পরিত্রাণ ঘটবে। এরা মনে করেন, ইহুদি ধর্মের আইন মেনে ধর্মীয়ভাবে জীবনযাপনের মধ্যেই শুধু মানুষের পরিত্রাণ।"

তিনি বইটির আরেক জায়গায় উল্লেখ করেছেন, "ইসলাম আসলে যিশুকে একজন মহান নবী হিসেবে স্বীকার করে নিয়ে এ ব্যাপারে মধ্যপন্থা অবলম্বন করে, যিনি অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করেছিলেন এবং নিশ্চিতভাবেই জন্ম নিয়েছিলেন কুমারী মাতা ম্যারির ঘরে। কুরআনের উনিশতম অধ্যায়ে 'ম্যারি' (আরবীতে 'মারিয়াম') আখ্যায়িত হয়েছেন; কুরআনে উল্লিখিত অন্য সব মহিলাদের চেয়ে তিনি বেশিবার উল্লিখিত হয়েছেন– এমনকি ওল্ড টেস্টামেন্টের উল্লেখের চেয়েও বেশি; তিনি ইসলামে সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধার নারীচরিত্র। তা সত্ত্বেও ইসলাম মতে, যিশু নিজে ইশ্বর ছিলেন না। বরং ছিলেন ঐশ্বরিকভাবে অনুপ্রাণিত মানবীয় নবী। গড (আল্লাহ) পুরোপুরি একক। আর মুসলিমদের জন্য, যিশুকে অস্বীকার করা খোদ ইসলামের ওপর বিশ্বাসেরই লঙ্ঘন; যেমন মুসলিমরা যিশুর অবমাননাকর শিল্পকর্মকে ব্লাসফেমি বলে ঘোষণা করে। কুরআন বিভিন্নভাবে যিশুকে উল্লেখ করেছে 'দ্য ওয়ার্ড অব গড' হিসেবে, 'দ্য স্পিরিট অব গড' হিসেবে, এবং 'সাইন অব গড' হিসেবে। কুরআনে যিশুকে অবমূল্যায়ন করে কোনো মন্তব্য নেই। অতএব, ইসলামহীন দুনিয়ায় যিশুর ইহুদি সমালোচনা আরও কঠোর হতো। যেমনটির প্রকাশ রয়েছে ইহুদি ধর্মে এবং তা এখনও আছে। একইভাবে ইহুদি ধর্ম মুহাম্মদ স.-কে একজন নবী হিসেবে মানে না। তা সত্ত্বেও ইসলাম ও ইহুদি ধর্মের মধ্যকার সম্পর্ক বিস্ময়কর। চেতনার দিক থেকে এই ধর্মদুটি অধিকতর কাছাকাছি, এ দুটি ধর্মের যে কোনো একটির সাথে খ্রিষ্টান ধর্মের মধ্যকার সম্পর্কের চেয়ে। ইসলাম ও ইহুদি উভয় ধর্মই প্রচণ্ডভাবে একেশ্বরবাদী। এরা উভয়ই প্রতিদিনের প্রার্থনায় ইশ্বরের একত্ব ঘোষণা করে কয়েকবার। ইহুদী ও আরবেরা উভয়ই সেমেটিক পিপল, যারা দীর্ঘকাল শেয়ার করেছে একই স্থান, একই ইতিহাস। কথা বলেছে এমনসব ভাষায়, যেগুলোর মধ্যে আছে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ইহুদি ও ইসলাম ধর্ম জোরালোভাবে আইনভিত্তিক; জীবনে এই আইনের ব্যক্তিগত পরিপূর্ণতার মাধ্যমেই মুক্তি অর্জিত হয়। বিভিন্ন বিষয়ে বিচারার্থে সিদ্ধান্ত দেয়ার জন্য উভয়ের রয়েছে ধর্মীয় আইনানুগ কমিউনিটি ল' কোর্ট। ইহুদি ধর্ম দৃঢ়তার সাথে বলে, গডকে জীবন্ত হিসেবে প্রতিকৃতিচিত্রণ করা যায় না কিংবা ব্যক্তিগতায়ন করা যায় না এবং তিনি (গড) কখনও মানবরূপ ধারণ করেন না। ইসলাম দৃঢ়তার সাথে ঠিক এই একই উপলব্ধি ধারণ করে যে, গড অ্যানথ্রোপোমরপিক (নরত্ব আরোপমূলক) নয়। অতএব, ইহুদি ও মুসলিমদের কাছে ক্রিশ্চিয়ান আর্ট আঘাতসৃষ্টিকর, যদিও ব্লাসফেমাস নয়।"

গ্রাহাম ফুলার তার বইটিতে আরও উল্লেখ করেছেন, "ইসলাম ও ইহুদি ধর্মে খাবার, পশুহত্যা, শূকরের গোশত না খাওয়া সম্পর্কিত ধর্মাচার ও ধর্মাচারে শুদ্ধতা অর্জনের অনেক বিধিবিধানে মিল আছে। অবশ্যই ইসলাম এগুলো নিয়েছে ইহুদি ধর্ম থেকে, কিন্তু ইসলাম ব্যাপকভাবে সরলায়ন করেছে জটিল 'জিউইশ কোশের ল'। ওরিয়েন্টাল ইহুদিরা (শেফারডিম) তাদের ধর্মাচারে প্রভাবিত হয়েছে শতাব্দীর পর শতাব্দী মুসলিমদের সাথে বসবাসের মাধ্যমে। আর মানুষের রক্তাক্ত ইতিহাসের সময়ের ব্যাপারে ইহুদিরাও স্বীকার করে, মুসলিমদের সমাজের সাথে বসবাসের সময় ইহুদিরা অনেক দুর্ভোগে পড়েছে। এ কথা স্বীকার করার পরও ইহুদি পণ্ডিতেরা প্রায় একমত যে, ইহুদি ধর্ম ও সংস্কৃতি খ্রিষ্টানদের অধীনের চেয়ে ইসলামের অধীনে শতাব্দীর পর শতাব্দী অধিকতর ভালো ছিল। ইউরোপে ভয়ঙ্কর লোমহর্ষক হলোকাস্টের অভিজ্ঞতার পর– ফিলিস্তিনিদের ভয়ানক মূল্যের বিনিময়ে– ১৯৪৮ সালে ইসরাইল রাষ্ট্রের সৃষ্টি ও ইহুদিদের জন্য হোমল্যান্ড প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটি উপস্থাপন করে এক নাটকীয় দুঃখজনক ক্রান্তিলগ্ন বা টার্নিং পয়েন্ট, যার ফল আজকের ইহুদি ও মুসলিমদের মধ্যকার টানটান ও ক্রোধপূর্ণ সম্পর্ক। অবশ্য, এই টানটান সম্পর্ক এখন পুরোপুরিভাবে ভূ-রাজনৈতিক। যুদ্ধ চলছে ভূখণ্ড ও নতুন ইসরাইলি রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কের প্রশ্নে।"

আমরা জানি, এই ইসরাইলের সৃষ্টির পেছনে যাবতীয় শক্তি জুগিয়েছে পাশ্চাত্য। তাহলে ফুলারের এই বিশ্লেষণ এটাই প্রমাণ করে, আজকের দিনের ইহুদি-মুসলিম বিরোধের জন্য দায়ী পাশ্চাত্য নীতি, এর জন্য মুসলিমরা বা তাদের অবলম্বিত ধর্ম ইসলাম দায়ী নয়। কেননা আব্রাহামিক তিন ধর্ম– ইহুদি, খ্রিষ্টান ও ইসলামের মধ্যে ফুলারের দেয়া ব্যাখ্যা মতে, ইসলাম সবচেয়ে সহনশীল। তার বইটির এক জায়গায় উল্লেখ আছে– কুরআন বলে, ইহুদিরা সবচেয়ে বড় ভুলটা করেছে ইশ্বরের বাণী গ্রহণের ক্ষেত্রে : ইহুদিরা নিজেদেরকে মনে করে ইশ্বরের 'ইউনিকলি চোজেন পিপল' হিসেবে। এদের উপলব্ধি হচ্ছে, একক ইশ্বর ইহুদিদেরই ইশ্বর (ওয়ান গড টু বি দ্য গড অব দ্য জিউস)। এদের আরও উপলব্ধি, জুডাইজম হচ্ছে একান্তভাবেই ইহুদিদের জন্য বাণী। কুরআন বলে– না, ইশ্বরের চোজেন পিপল বলতে কিছু নেই : "যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে দয়াময় অবশ্যই তাদের জন্য সৃষ্টি করবেন ভালোবাসা"– কুরআনের ১৯ নম্বর অধ্যায়ের ৯৬ নম্বর আয়াত। এভাবে সেন্ট পলের মেসেজও ইহুদি ধর্মের বিরুদ্ধে যায়– গড সম্পর্কিত যিশুর বাণী শুধু ইহুদিদের জন্য নয়, গোটা মানবজাতির জন্য।"

এরপরও ইসলাম ও ইহুদি ধর্মে মনে করা হয়– খ্রিষ্টানদের 'ইশ্বরের পুত্র' ধারণা 'একক সৃষ্টিকর্তা' ধারণার প্রতি অবমাননাকর। এছাড়া, গড কোনো সন্তান জন্ম

দেননি এবং তাকে উপবিভাগে বিভাজিতও করা যায় না। ট্রিনিটির ধারণা করাঘাত করে বহু ইশ্বরবাদে, যা ইহুদি ও ইসলাম ধর্মে একটি অ্যানাথিমা বা অভিশপ্ত বিষয়। এ বিষয়টি তুলে ধরতে এই লেখক বইটির প্রথম অধ্যায়ের শিরোনামের ঠিক নিচেই উল্লেখ করেছেন কুরআনের ১১২ নম্বর সূরাহ্‌র ৩ নম্বর আয়াত : "তিনি (আল্লাহ) কাউকে জন্ম দেননি এবং তাকেও জন্ম দেয়া হয়নি।" এভাবে ধর্মতত্ত্ব ও ইতিহাসের চুলচেরা বিশ্লেষণ করে গ্রাহাম ফুলার তার বইটিতে সাফল্যের সাথে দেখাতে পেরেছেন, ইসলাম না থাকলেও পৃথিবীটা আজকে থেকে ভিন্ন কোনো শান্তিময় কিছু হয়ে যেতো না। কারণ, ইসলাম অন্যান্য ধর্মানুসারীদের জন্য যতটা স্পেস দিয়েছে, আর কোনো ধর্ম তা পারেনি।

গ্রাহাম ফুলার তার আলোচ্য বইটিতে অনেক কিছুর মাঝে আরও যে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ের অবতারণা করেছেন সেটি হচ্ছে: ধর্ম, ক্ষমতা ও রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক। এ সম্পর্কে লেখকের অভিমত, পাশ্চাত্য ইতিহাসের বেশিরভাগজুড়ে ধর্ম ও রাষ্ট্রের মধ্যকার 'ক্লোজ অ্যাফিলিয়েশন' যতটা না মন্দ প্রভাব ফেলেছে ইসলাম ও ইসলামী দুনিয়ার ওপর, তার চেয়েও বেশি মন্দ প্রভাব ফেলেছে খ্রিষ্টানত্ব ও খ্রিষ্টানদের ইতিহাসের ওপর। হেরেসির ধারণা এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হেরেসিগুলো কী করে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জনগণের বিরোধিতার হাতিয়ার হয়ে উঠেছে, সে দিকে আলোকপাত রয়েছে এ বইয়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, হেরেসি হচ্ছে প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধী বিশ্বাস, যা সাধারণত কর্তৃপক্ষ সহজে মেনে নিতে চায় না। বইটির উল্লিখিত প্রথমাংশে যে ছয়টি অধ্যায় রয়েছে, সেগুলোর প্রতিপাদ্য এই 'হেরেসি অ্যান্ড পাওয়ার'। এই অংশে লেখক তুলে এনেছেন ইতিহাসের আনাচে কানাচের ছোট ছোট নানা বিষয়। তার আলোচনায় এসেছে অন্য অনেক কিছুর মাঝে– ক্রুসেড, আরব, বাইজান্টাইন ও বিভিন্ন ধর্মের উদ্ভবের ইতিহাসের বিষয়। আছে ভারতে ইসলাম, পাশ্চাত্যে ইসলাম, চীনে ইসলাম, রাশিয়া ও ইসলাম ইত্যাদি বিষয়ের ওপর আলোকপাত। বাদ যায়নি উপনিবেশবাদ, জাতীয়তাবাদ ও ইসলাম বিষয়ের আলোচনাও।

পঞ্চম অধ্যায়টির আলোচ্য বিষয় ক্রুসেডগুলোর ইতিহাস। এ অধ্যায়ে তিনি ইতিহাস আলোচনা করে বলতে চেয়েছেন, মুসলিম বা খ্রিষ্টান মৌলবাদীরা মনে করেন ক্রুসেডের ঘটনাবলির মধ্য দিয়েই সভ্যতার সঙ্ঘাত বা ক্ল্যাশ অব সিভিলাইজেশনের সূচনা। কিন্তু ঘনিষ্ঠ ও গভীরভাবে তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে, কাহিনী এর চেয়েও জটিল। দেখা যাবে, পাশ্চাত্যের সৈন্য প্রাচ্যে পাঠানোর উদ্যোগ ছিল একটি ভূ-রাজনৈতিক পদক্ষেপ। গভীরভাবে বিবেচনা করলে দেখা যাবে, ঐতিহাসিক বাস্তবতা হচ্ছে ক্রুসেডের পেছনে ধর্মীয় শক্তির বাইরে আরও অনেক শক্তিধর পক্ষও সংশ্লিষ্ট ছিল। তাদের লক্ষ্য ছিল, বিদেশে পাশ্চাত্যশক্তির সম্প্রসারণ এবং ইউরোপে একটি

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক শক্তির বিকাশ ঘটানো। ইসলাম না থাকলেও প্রাচ্যবিরোধী এক ধরনের পাশ্চাত্য ক্রুসেড ঘটত।

বইটিতে লেখক উল্লেখ করেছেন– পশ্চিমাদের একটা প্রবণতা হচ্ছে, এরা ইসলামকে দেখে এক ধরনের পূর্বঅপরিচিত বহিরাগত এবং পাশ্চাত্য প্রেক্ষাপট থেকে বিচ্ছিন্ন উদ্ভট কিছু হিসেবে। সেজন্য গ্রাহাম ফুলার চেষ্টা করেছেন, অন্যান্য ধর্মের, বিশেষ করে ইহুদি ও খ্রিষ্টান ধর্মের পেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে ইসলামকে উপস্থাপন করতে। এবং তিনি সাফল্যের সাথে তার পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিশেষজ্ঞ জ্ঞান দিয়ে যথার্থভাবেই তা করতে সক্ষম হয়েছেন। এই বইটি যারা পড়েছেন, নিঃসন্দেহে এ সত্যটুকু স্বীকার করতে বাধ্য হবেন।

আলোচ্য বইটির শেষ অধ্যায়টি হচ্ছে এর চতুর্দশতম অধ্যায়। সেখানে এই লেখক বলতে চেয়েছেন, পাশ্চাত্য ইসলাম সম্পর্কে ভুল নীতি ও ধারণা পোষণ করে চলেছে। পাশ্চাত্যকে সেই ভুল নীতি অবলম্বন থেকে সরে আসতে হবে। অবলম্বন করতে হবে নতুন নীতি। সেই দিকটির প্রতি লক্ষ রেখেই তিনি এ অধ্যায়ের শিরোনাম করেছেন : 'হোয়াট টু ডু? টুয়ার্ড অ্যা নিউ পলিসি উইথ দ্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড'। লেখক এ অধ্যায়ে তুলে ধরেছেন পাশ্চাত্যের করণীয় সম্ভাব্য একটি কর্মতালিকা, যা পাশ্চাত্য অবলম্বন করতে পারে এই কথিত 'ইসলাম' সমস্যার সমাধানে।

এই অধ্যায়ে শুরুতেই লেখক অভিমত প্রকাশ করেছেন, কেউই পৃথিবীর সন্ত্রাস একবারে শেষ করতে পারবে না। এটি অনেক কিছুর মাঝের একটি সমস্যা এবং ভিন্ন ধরনের নানা রাজনীতির মধ্যে অধিকতর কলুষিত ধরনের রাজনীতিরই একটি হচ্ছে সন্ত্রাস। এই সন্ত্রাসকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় ও সীমিত করা যায়। দুর্ভাগ্য, যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান নীতিতে সে কাজটিই করা হচ্ছে না। আসলে এরা সমস্যাটিকে আরও উত্তেজিত করেছে। এ ক্ষেত্রে এরা প্রথম ভুলটি করে সন্ত্রাসের আইনি ও স্বার্থান্বেষী সংজ্ঞা গ্রহণ করে, যাতে বাস্তবজগতের সমাধান টানা হয়নি। স্বীকার্য, এ সমস্যার সংজ্ঞা সম্পর্কে আন্তর্জাতিক মতৈক্যে পৌঁছার বিষয়টি দীর্ঘদিন থেকে গেছে কন্টকাকীর্ণ। আমেরিকান সরকারগুলোর শেষ কথা: 'টেরোরিজম ইজ হোয়াট আই সে ইট ইজ'– আমেরিকা যেটাকে সন্ত্রাস বলবে সেটাই সন্ত্রাস। তার এই যুক্তির সমর্থনে তিনি আবারও প্রবেশ করেছেন মুসলিম বিশ্বের ইতিহাসের গভীরে। যাতে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়েছে, ইসলামী দুনিয়ার প্রতি আমেরিকার ভুলনীতি অবলম্বনের বিষয়টি।

সবশেষে এই অধ্যায়ে অতি পাণ্ডিত্যপূর্ণভাবে লেখক উল্লেখ করেছেন, মুসলিম বিশ্ব ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার বিদ্যমান দ্বন্দ্ব অবসানে সুনির্দিষ্টভাবে কী কী পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। তার উল্লিখিত পদক্ষেপগুলোর মধ্যে আছে:

০১. মুসলিমদের প্রকোপিত করে, মুসলিম জগতে পাশ্চাত্যকে এ ধরনের সব সামরিক ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে, যাতে এরা শান্ত হওয়ার কাজটি শুর করতে পারে।

০২. সন্ত্রাসী ও নিরোধ-অবরোধকর্মকাণ্ড চিহ্নিত করার পদক্ষেপ পরিচালিত করতে হবে গোয়েন্দা ও পুলিশিকর্মের মাধ্যমে; সন্ত্রাসী ধারায় প্রাধিকার পাবে আন্তর্জাতিক সংস্থা ও স্থানীয় দেশগুলো। যুক্তরাষ্ট্র অবৈধভাবে কোনো দেশের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন করে ইচ্ছামতো কাউকে ধরতে ও হত্যা করতে পারবে না।

০৩. আমেরিকার জন্য বদনাম বয়ে আনে ও গণতন্ত্রের প্রতি আমেরিকার প্রতিশ্রুতিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, রাজনৈতিক বিস্ফোরণুখ পরিস্থিতির জন্ম দেয় এবং আমেরিকার প্রতি ক্ষোভ সৃষ্টি করে– যুক্তরাষ্ট্রকে এমন আমেরিকাপন্থী স্বৈরশাসকদের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করতে হবে।

০৪. মুসলিম দুনিয়ায় গণতন্ত্রায়নকে এগিয়ে যেতে দিতে হবে, তবে সেখানে গণতন্ত্র প্রোথিত করায় আমেরিকা চালিকাশক্তি হবে না। আদর্শগতভাবে, আমেরিকা এ প্রক্রিয়ায় তার হস্তক্ষেপ বন্ধ রাখবে, যাতে অতীতের মতো যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের সংশ্লিষ্টতায় গণতন্ত্র নিষ্প্রভ না হয়। অতীতে যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত লক্ষ্য অর্জনে গণতন্ত্রায়নে যুক্তরাষ্ট্রের সিলেকটিভ ও ইনস্ট্রুমেন্টাল ব্যবহার সংশ্লিষ্ট দেশটির গণতন্ত্রায়ন কর্মসূচির ধারণাকে কলঙ্কিত করেছে।

০৫. যুক্তরাষ্ট্রকে অবশ্যই মেনে নিতে হবে, বেশিরভাগ মুসলিম দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ইসলামপন্থী দলগুলোকে আইনিভাবে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসার সুযোগ দিতে হবে। শুভ সংবাদ হচ্ছে, ইসলামপন্থী দলগুলো এক বছরের মধ্যে জনগণকে দেয়া তাদের প্রতিশ্রুতি পালনে কিংবা জনগণের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হলে সমালোচনার মুখে পড়বে। এর অর্থ, এরা শূন্যগর্ভ সাম্রাজ্যবিরোধী রিটোরিকে নয়; জরুরি অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা দূর করায় ব্যর্থ হবে।

০৬. দ্রুত ফিলিস্তিন সমস্যার একটি সমাধান বের করতে হবে। মুসলিম জগৎজুড়ে ধরে নেয়া হয়, এ সমস্যা হচ্ছে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের সবচেয়ে কুখ্যাত ঘটনা, যা স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে স্থানচ্যুত করে এদেরকে ঠেলে দিয়েছে শরণার্থী শিবিরের নিদারুণ জীবনযাপনের অবস্থায়, ইসরাইলে এদের ওপর আরোপ করা হয়েছে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকত্ব, কিংবা এদের ঠেলে দিয়েছে নির্বাসনে- ৬০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। র‍্যাডিকেলাইজেশনের সাথে ফিলিস্তিনিদের দুর্ভোগ বেড়েছে, যা ছড়িয়ে পড়েছে ফিলিস্তিনের বাইরেও। এ সঙ্কট দ্রুত একটি সমাধান দাবি করে, এর সাধারণ সমাধান সব পক্ষের কাছে সুপরিচিত। ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে ইসরাইলি উপনিবেশায়নের অবসান ও এ পরিবর্তন অবশ্যই দরকার।

০৭. ওয়াশিংটন মধ্যপ্রাচ্যে হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের পেছনে যে এক ট্রিলিয়নেরও বেশি ডলার অপব্যয় করে, যদি এর এক-দশমাংশও স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয়, ক্লিনিক, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পেছনে ভালোভাবে খরচ করত, তবে এই অঞ্চলের চেহারা বদলে যেত। যুক্তরাষ্ট্রের ভাবমর্যাদা অনেক উঁচুতে উঠে যেত। এ অঞ্চলের মানুষের জীবনযাপনের মানে অগ্রগতি আসত।

০৮. যুক্তরাষ্ট্র আলোকিত নীতি অবলম্বন করলে দ্রুত বন্ধ হয়ে যেত ভায়োল্যান্স ও র‍্যাডিকেলিজমের যাবতীয় ইন্টারন্যাশনাল ও ট্রান্সন্যাশনাল উৎস; দেশ বিশেষের অভ্যন্তরীণ সন্ত্রাসের উৎসের প্রশ্নে প্রয়োজন স্থানীয় পরিস্থিতি সাপেক্ষে আলাদা ব্যাখ্যা ও পদক্ষেপ এবং যে কোনো ক্ষেত্রে এ সমস্যা তখন কমে আসত।

০৯. শুধু মুসলিমরা (অর্থাৎ স্থানীয়রা) তখন সক্ষম হবে স্থানীয় ইসলামিক র‍্যাডিকেলিজম মোকাবেলা করতে।

গ্রাহাম ই. ফুলার যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে এ করণীয় তালিকাটি তৈরি করেছেন বিদ্যমান বিশ্বদ্বন্দ্ব ও সংশ্লিষ্ট ধর্মগুলোর ধর্মতত্ত্ব ও সামগ্রিক ইতিহাসের গভীরে পৌঁছে। ধর্মতত্ত্ব ও ইতিহাসের নির্মোহ বিশ্লেষণ সূত্রেই তিনি এসব সমাধান সূত্র উপস্থাপন করেছেন। বিশ্বকে দ্বান্দ্বিক অবস্থান থেকে উত্তরণকামী বিবেকবান ও সচেতন পাঠক মাত্রই বইটি পাঠে এ ব্যাপারে অন্য ধরনের সুখবোধের অবকাশ পাবেন। সবশেষে প্রত্যাশা রইলো, পাশ্চাত্যের প্রতি তিনি যে উপলব্ধির তাগিদ এই বইটির মাধমে রেখেছেন এবং সে তাগিদসূত্রে যে নীতি অবলম্বন করে মধ্যপ্রাচ্য সমস্যার সমাধান টানারও তাগিদ দিয়েছেন, তা বাস্তবায়নে যুক্তরাষ্ট্র ও বিশ্বসমাজ ইতিবাচক সাগ্রহী পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে আসবে। আর আমরা পাব অধিকতর শান্তিময় এক বিশ্ব।

গোলাপ মুনীর
সহকারী সম্পাদক, দৈনিক নয়া দিগন্ত